খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 7 1 October 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা ১ অক্টোবর ২০১৩ মঙ্গলবার ২ টাকা

• মনসান্টো পৃ ২ • সংবাদ সংলাপ পৃ ২ • পুঁজি রাষ্ট্র পৃ ৩ • রামপাল পৃ ৩ • মিঠি ভিরদি ৩ • পুরসভা পৃ ৪ • স্বাধীনতা পৃ ৪ • অন্য আমেরিকা পৃ ৪

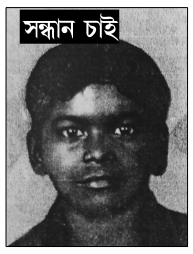

দেবাশীষ হালদার নামে ১১ বছরের এই ছেলেটির বাড়ি কুলপী থানার নিশ্চিন্তপুরে। দাদুর বাড়ি জয়নগর থানার মজিলপুর থেকে নিমপীঠ যাবার রাস্তায় বাগবেড়িয়ায়। দাদু দিবাকর কুমার (৬০) মাছ বিক্রেতা হিসেবে অনেকের পরিচিত। গত ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে এই ছেলেটি নিখোঁজ, তাকে শেষ দেখা গেছে জয়নগর স্টেশনে। পরনে ছিল একটি জিনসের হাফ প্যান্ট ও গায়ে লাল রঙের গেঞ্জি। কপালের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ আছে। বাবার নাম নিতাই হালদার (৪০–৪২), মোবাইল নম্বর ৮৬৪১০৬৩৩২১। এই নম্বরে সন্ধান পেলে জানাতে অনুরোধ।

এবার ফুকুশিমার জ্বালানি রডের কুলুঙ্গি ধ্বংসের মুখে, হিরোশিমা বোমার পনেরো হাজার গুণ বিকিরণের সামনে বসুন্ধরা

হার্ভে ওয়াসেরম্যান, ফ্রি প্রেস ডট অর্গ থেকে নেওয়া, মূল প্রতিবেদনটি ২৩ সেপ্টেম্বর লেখা •

আর দু–মাসের মধ্যে আমরা মানবজাতির ইতিহাসের অন্যতম বড়ো সঙ্কটের মুখোমুখি হতে চলেছি। এখনই কাজে নামা ছাড়া আর উপায় নেই। ফুকুশিমার ৪নং চুল্লির ব্যবহৃত জ্বালানি যেখানে জমা আছে, তার দিকে আমাদের গোটা প্রজাতিকে তার হাতে থাকা সমস্ত সম্পদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ফুকুশিমার মালিক, টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানি (টেপকো) বলেছে, আর মাত্র ৬০ দিনের মধ্যে সে চেষ্টা করবে ১৩০০টি ব্যবহৃত জ্বালানি রড সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করবে, যা এখন খোলা আকাশের নিচে ১০০ ফুট উঁচুতে একটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কুলুঙ্গিতে রাখা আছে। কুলুঙ্গিটি রয়েছে একটা ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোর ওপর যা বাঁকছে, ডুবছে এবং যদি নিজে থেকে না ভেঙে পড়ে, তবে পরের ভূমিকম্পে ভেঙে পড়বে নিশ্চিত।

ওই কুলুঙ্গিতে রাখা ৪০০ টনের মতো জ্বালানি থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ হতে পারে, তা হিরোশিমা পরমাণু বোমার ১৫ হাজার গুণ।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, এই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য যে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত অথবা অর্থনৈতিক সম্পদ দরকার, তা টেপকোর নেই। জাপান সরকারেরও নেই। আসন্ন বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রয়োজন আবিশ্ব সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও কলাকুশলীদের সম্মিলিত প্রয়াস।

কেন এটা এত জরুরি?

আমরা এর মধ্যে জেনে গেছি, হাজার হাজার টন মারাত্মক তেজস্ক্রিয় জল ফুকুশিমা পরমাণু প্রকল্পের থেকে ভূ-গর্ভস্থ জলে মিশছে। বিষাক্ত দীর্ঘায়ু আইসোটোপগুলো চলে যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরে। ফুকুশিমার তেজস্ক্রিয়তা মাখা সামুদ্রিক উদ্ভিদ পাওয়া গেছে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে। আমরা আরও অনেক খারাপ কিছুরই আশঙ্কা করতে পারি।

ফুকুশিমার তিনটি গলে যাওয়া চুল্লি যে কোনো মূল্যে ঠান্ডা রাখার জন্য টেপকো সেখানে আরও আরও জল ঢেলে চলেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে মনে হচ্ছে, ফিশন হয়তো এখনও চলছে মাটির নিচে কোথাও। কিন্তু কেউ জানে না, চুল্লির কোরগুলি ঠিক কোথায় রয়েছে।

এই তেজস্ক্রিয় জলের বেশির ভাগই জমা করা হচ্ছে চুল্লির আশেপাশে তাড়াহুড়ো করে গড়ে তোলা হাজার খানেক নড়বড়ে ট্যাঙ্কে। অনেকগুলোই এরমধ্যেই লিক করতে শুরু করেছে। পরবর্তী ভূমিকম্পে সবগুলো মাটিতে মিশে যাবে, প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়বে হাজার হাজার টন স্থায়ী বিষ। নিত্যনতুন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, টেপকো সদ্য আরও হাজার টনের মতো তেজস্ক্রিয় তরল সাগরে ফেলেছে।

প্রকল্পের ঢালা জলে ফুকুশিমার যেটুকু কাঠামো এখনও টিকে রয়েছে, তা আরও নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে, ৪নং ইউনিটের জ্বালানি রডের কুলুঙ্গিটি শুদ্ধু।

৪নং চুল্লির ৫০ মিটার দূরত্বে সাধারণ কুলুঙ্গিতে ৬০০০ জ্বালানি রড রাখা আছে এখন। তাদের কিছুতে আছে প্লুটোনিয়াম। এই কুলুঙ্গিটির মাথার ওপর কোনো ঢাকনা নেই। ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা নষ্ট হলে, পাশের কাঠামোটি ভেঙে পড়লে, আরেকটি ভূমিকম্প হলে বা সুনামি হলে এবং আরও এই ধরনের হাজার কারণে এই কুলুঙ্গিটি ভেঙে পড়তে পারে।

সব মিলিয়ে ১১ হাজারের মতো জ্বালানি দণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ফুকুশিমার প্রকল্প এলাকা জুড়ে। মার্কিন পরমাণু বিভাগের প্রাক্তন অফিসার ও প্রবীণ বিশেষজ্ঞ রবার্ট আলভারেজ–এর মতে চের্নোবিলে যে পরিমাণ প্রাণঘাতি সিজিয়াম ছড়িয়েছিল, তার তুলনায় ৮৫ গুণ রয়েছে এখানে।

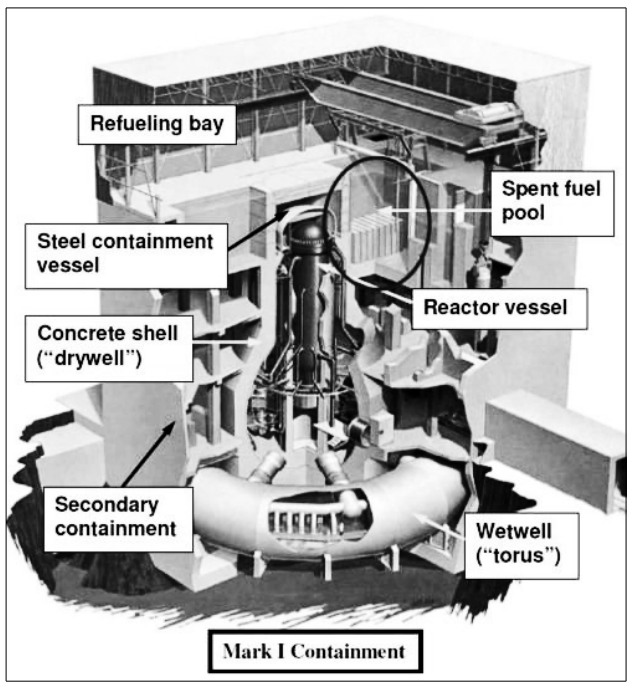

(বাঁয়ে) ফুকুশিমার চার নম্বর ইউনিটের ডিজাইনে স্পেন্ট ফুয়েল পুল বা ব্যবহৃত জ্বালানি কুণ্ডলী। (ডানে) ধ্বংসের মুখে চার নম্বর ইউনিট।

সারা জাপান জুড়ে পাওয়া যাচ্ছে তেজস্ক্রিয় হটস্পট। স্থানীয় বাচ্চাদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত থাইরয়েড দেখা যাচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছে, এক্ষুনি ওই জ্বালানি দণ্ডগুলো ৪নং ইউনিটের জ্বালানি কুলুঙ্গি থেকে বের করে আনা দরকার।

১১ মার্চ ২০১১–র ভূমিকম্প এবং সুনামিতে ফুকুশিমার বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার ঠিক আগে, ৪নং ইউনিটের কোরটি বের করে আনা হয়েছিল নিয়মমাফিক সুরক্ষা এবং জ্বালানি পুনর্সংযোগের জন্য। আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার বেশ কিছু চুল্লির মতো জেনারেল ইলেকট্রিকের গড়া এই চুল্লিতেও কোরের কাছেই ১০০ ফুট উঁচুতে থাকে জ্বালানি কুলুঙ্গি।

ব্যবহৃত জ্বালানি যে করে হোক জলের তলায় রাখতেই হয়। এটা জারকোনিয়ামের সংকরের আবরণে থাকে যা বাতাসের সংস্পর্শে আসলে নিজে থেকেই জ্বলে ওঠে। জারকোনিয়ামের ব্যবহার অনেকদিন ধরেই ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্বে করা হয়, এর খুব উজ্জ্বল শিখার কারণে।

প্রতিটি উন্মুক্ত রড থেকে এতটাই বিকিরণ হতে পারে, যা কাছে দাঁড়ানো কোনো মানুষকে কয়েক মিনিটের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে। একটা বড়োসড়ো আগুন জ্বলে ওঠা দেখে ওই চুল্লির কাছাকাছি কাজ করতে থাকা সমস্ত কর্মচারী পালিয়ে যেতে পারে, তাতে ইলেকট্রনিক মেশিনগুলি অকেজো হয়ে যাবে।

একটি জ্বালানি রড তৈরির কোম্পানিতে চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আরনি গুন্ডারসেনের মতে, ৪নং ইউনিটের কোরের কাছে থাকা জ্বালানি কুলুঙ্গিটি বেঁকে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঠুনকো দশায় এসে পৌঁছেছে, যে কোনো সময় ভেঙে পড়বে। ক্যামেরাতে দেখা গেছে, জ্বালানি কুলুঙ্গিটিতে ধ্বংসের চিহ্ন।

৪নং ইউনিটটি খালি করার প্রাযুক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির বাধাগুলিও অভূতপূর্ব। কিন্তু এটা করতেই হবে, এবং ১০০ শতাংশ সঠিক ভাবে।

এই প্রয়াস ব্যর্থ হলে জ্বালানি রডগুলি বাতাসে উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং আগুন ধরে যাবে, আবহাওয়ায় মিশে যাবে ভয়ঙ্কর পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা। কুলুঙ্গিটি মাটিতে ভেঙে পড়লে জ্বালানি রডগুলি মাটিতে একসাথে এর ওর ঘাড়ের ওপর পড়বে, ফিশন হয়ে যেতে পারে, বিস্ফোরণও হতে পারে। যে তেজস্ক্রিয় মেঘটি এর মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে, তা আমাদের সকলের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে।

১৯৮৬ সালের চের্নোবিলের তেজস্ক্রিয়তা ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছেছিল দশ দিনে। ২০১১–র ফুকুশিমার তেজস্ক্রিয়তা পৌঁছতে সময় লেগেছিল সাত দিনেরও কম। ৪ নং ইউনিটের জ্বালানিতে আগুন লাগলে তার থেকে তেজস্ক্রিয়তা আমাদের বিষাক্ত করতেই থাকবে কয়েক শতাব্দী ধরে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মিৎসুহেই মুরাতা বলেছেন, ফুকুশিমা থেকে পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় বিকিরণ হলে, 'তাতে বিশ্বের পরিবেশ এবং আমাদের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটা কোনো জটিল বিজ্ঞান নয়, পরমাণু প্রকল্প নিয়ে কোনো কূটতর্কও নয়। এটা মানব সভ্যতার টিকে যাওয়ার প্রশ্ন।'

টোকিও ইলেকট্রিক বা জাপান সরকার, কেউই একা এই আসন্ন বিপর্যয় মোকাবিলা করতে পারবে না। এই গ্রহের সর্বোত্তম বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সম্মিলিত টিম পাঠানোর কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের হাতে মাত্র আর দু–মাস রয়েছে এই কাজ করার জন্য। ঘড়ি দৌড়চ্ছে। বিশ্বের পরমাণু ইন্ডাস্ট্রি হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে রাত পোহানোর অপেক্ষায়।

খোলা রাস্তার ওপর জুয়ার আসর

২১ সেপ্টেম্বর, সুব্রত দাস, বদরতলা, মেটিয়াবুরুজ •

যশোর রোড ধরে শ্যামবাজার থেকে দমদমের দিকে যারা যাতায়াত করে, একটু নজর করলেই তারা দেখে থাকবে, লেকটাউন আর যশোর রোডের সংযোগস্থলে অটো স্ট্যান্ডের সম্মুখে প্রতিদিন প্রকাশ্যে জুয়াখেলা চলছে। একটা টেবিলের ওপর চাদর বিছিয়ে ক্যারম বোর্ডের তিনটে স্ট্রাইকার সাজিয়ে জুয়া। খেলাটা হল, ওই সাজানো তিনটে স্ট্রাইকারের একটার নিচে একটা ছবি লাগানো রয়েছে আর তিনটে স্ট্রাইকার একরকম দেখতে। যে খেলতে আসবে তাকে আন্দাজ করতে হবে কোন স্ট্রাইকারের নিচে ওই ছবিটা আছে। সেই অনুযায়ী ওই স্ট্রাইকারের ওপর যত টাকা রাখবে, মিলে গেলে ওই টাকার দ্বিগুণ পাওয়া যাবে। খেলার নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ৫০ টাকা খেলতে হবে।

আমি সামনে থেকে অটো ধরার যাত্রী সেজে দেখছি শুধু হাতের কারসাজি। লোভী মন একবার চাইবেই ১০০ টাকা দ্বিগুণ করে বাড়ি ফিরে যেতে। বাড়ি ফিরে আয়েশ করে গিন্নিকে ১০০ টাকা অতিরিক্ত আয়ের কথা বীরত্বের সঙ্গে বলা যাবে! কিন্তু ওখানেই ধোঁকা।

প্রথম ১০০ টাকায় যেই দ্বিগুণ ফেরত পাওয়া যাবে, ওরা আপনাকে অনুরোধ করবে স্ট্রাইকারের ওপর ৫০০ টাকা ধরতে। তখন আপনি ধোঁকা খাবেন। বহু পথচলতি মানুষ প্রতিদিন এইভাবে ঠকছে। এমনকী যখন আপনার পকেটের টাকা শেষ, ওরা আপনাকে বলবে, মোবাইল, হাতের আংটি কিংবা গলার চেনটা বাজি ধরুন, দেখুন কীভাবে আপনার লোকসান হওয়া টাকা কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে।

এই ধরনের জুয়া গ্রাম্য মেলাগুলোতে সচরাচর চোখে পড়ে। তা বলে খোদ কলকাতার বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে আগে এরকম কখনও চোখে পড়েনি। তবে হ্যাঁ, হাওড়ার মিনিবাস স্ট্যান্ডে এই খেলা মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে। এই ধরনের জুয়ার ফলে লেকটাউনের মতো জমজমাট চত্বরে সাধারণ মানুষ তো প্রতারিত হচ্ছেই, স্কুল–কলেজের ছাত্ররাও এর খপ্পরে পড়ছে। প্রশাসন কি জেগে ঘুমোচ্ছে?

সদ্যোজাত বেড়ালটা রক্ষা পেল

২৬ সেপ্টেম্বর, জিতেন নন্দী •

সন্তোষপুর স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। মাঝে রেললাইন। দূরে রেল ক্রসিংয়ের দিক থেকে বজবজের ট্রেন আসছে। ওপাশের ১নং প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুটে এলেন এক মহিলা। রেললাইন টপকাচ্ছিলেন একজন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে ওই মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লাইনের ওপর একটা বেড়াল বাচ্চা, ওটাকে শিগ্‌গির প্ল্যাটফর্মের ওপর তুলে দিন।' লোকটা আবার পিছন ফিরে এসে বেড়াল বাচ্চাটার ঘেঁটি ধরে ২নং প্ল্যাটফর্মে তুলে দিলেন। তারপর নিজে ১নং প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলেন। ট্রেনটা এসে স্টেশনে থামল।

এতটুকু একটা সদ্যোজাত বেড়াল, একটা হাতের তালুতে এঁটে যায়। সবে কদমগাছের সামনে ডালা বিছিয়ে বসেছেন নিমকিওয়ালা। শুধু নিমকিই নয়, ডালায় রয়েছে বাদামের পাটালি, চালকুমড়োর মোরব্বা আর বেসনের গাঠিভাজা। হাতে কতকগুলো নিমকি ভেঙে নিয়ে তিনি বেড়ালটার মুখের সামনে ছড়িয়ে দিলেন। বেড়ালটা মুখ বাড়িয়ে খেতে গেল বটে, তবে এখনও নিমকি খাওয়ার মতো জোর তার হয়নি।

ইতিমধ্যে একজন মহিলা কানে মোবাইল ঠাসতে ঠাসতে ঊর্ধমুখী হয়ে বেড়ালটার ওপর চটিশুদ্ধু পা–টা প্রায় চাপিয়ে দিয়েছেন আর কি। চারদিক থেকে সমস্বরে আওয়াজ উঠল, ইস্–স–স। মহিলা পা–টা সরিয়ে নিয়ে গটমট করে বেরিয়ে গেলেন। এক নিত্যযাত্রী নিমকিওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'কীরকম বুদ্ধি তোমার, রাস্তার মাঝে খাওয়াচ্ছ ওকে?' নিমকিওয়ালা বেড়ালটার ঘেঁটি ধরে পিছনের পান–সিগারেটের গুমটির নিচে ওকে ঢুকিয়ে দিলেন। আরও কিছুটা নিমকি গুঁড়ো করে ওর সামনে ছড়িয়ে দিলেন। এতক্ষণে সবার নিশ্চিন্তি। বেড়াল বাচ্চাটা এযাত্রায় বোধহয় বেঁচে গেল।

বালুচিস্তানের ভূমিকম্প পীড়িতদের সাহায্য চাই

'শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তান ভারত জনমঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা'র প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ৩০ সেপ্টেম্বর •

গত ১৭ ও ২১ সেপ্টেম্বর মাত্র চারদিনের ব্যবধানে পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের ইরানের সীমানা সংলগ্ন আউরান শহরের ৯৪ কিমি উত্তরে দুই দিনের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ওই এলাকার জনজীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে, ভূমিকম্পের দুই কেন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৩০ কিমি। নিহতের সংখ্যা ৩৭৫। বেসরকারি হিসেবে, সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। আহতের সংখ্যা চার শতাধিক। একাধিক জেলা জুড়ে প্রায় এক লক্ষ অষ্টাশি হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। সহায় সম্বল হারিয়ে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। খাদ্য পানীয় জল অমিল। অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার স্থানীয় মানুষজন। রিলিফের সামগ্রী দূর প্রত্যন্ত এলাকায় ঠিকমতো পাঠানো যাচ্ছে না। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বালুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন, প্রতিক্রিয়ায় সরকারি অত্যাচার নানা গুপ্তহত্যা আর তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ রিলিফ সরবরাহে সমস্যা তৈরি করছে।

'শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তান ভারত জনমঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা'র পক্ষ থেকে আমরা বালুচিস্তানের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ বেদনায় সমব্যথী, সহমর্মী। যারা পরিবারের মানুষজনকে হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই। তাদের এই দুর্দশায় সম্ভবপর সহায়তা প্রদান করতে আমরা উৎসুক ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, বালুচিস্তানের এই নিদারুণ ভূমিকম্পের ব্যাপারে ভারতের গণমাধ্যম, প্রচারমাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যম এক নির্লিপ্তির ভূমিকা নিয়েছে। তাদের প্রচারের মুখ্য বিষয় ভূমিকম্পের ফলে আরব সাগরের তীরে হঠাৎ করে জেগে ওঠা দ্বীপ। বালুচিস্তানের ভূমিকম্প পীড়িত মানুষের দুঃসহ অবস্থা নিয়ে ভারতের মানুষকে অবগত করতে তারা প্রায় কোনো ভূমিকাই রাখছে না। তাদের এই ভূমিকার আমরা তীব্র নিন্দা করি।

সম্পাদকের কথা

হঠাৎ গরু নিয়ে কেন?

প্রায় প্রতিবছর বকরিদের আগে কিছু পোস্টার দেখা যায় বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে। সম্প্রতি বজবজ লোকালের কামরায় দেখা গেল এরকম চারটে পোস্টার। 'গরু আমাদের মা, গরু হত্যা রাষ্ট্রীয় অপরাধ', 'গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণা করতে হবে' ইত্যাদি। হঠাৎ গরু হত্যা কেন? যে কোনো হত্যাই তো অপরাধ। আর যদি সাফ সাফ বকরিদে গরুর কোরবানি নিয়ে কথা বলা হয়, তাহলে বলতে হয়, গরু, ছাগল বা মুরগি, যেগুলো আমরা মানুষেরা খাই, কোনোটাই তো নৃশংসতার বিচারে কম নয়। তখন আসবে 'গরু আমাদের মা' — মাকে হত্যার প্রশ্ন। মা নয় এরকম কাউকে হত্যা করা কী কম অপরাধ? আসলে এইসময়ে এইসব প্রসঙ্গ তোলার মধ্যে এক ধরনের বিদ্বেষকে খুঁচিয়ে তোলার উদ্দেশ্য রয়েছে। কোনো নৈতিক বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন এতে নেই।

নৈতিক বিচারের প্রশ্ন অবশ্যই রয়েছে। সেটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমাদের পড়শি বলতে যদি আমরা আমদের চারপাশের প্রকৃতি জগৎ মনে করি, তখন গাছপালা, পায়ের নিচের দুর্বোঘাস, পোকামাকড়, পাখি, জীবজন্তু এবং মানুষ সকলেই আমাদের পড়শি। এটা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারলে আমাদের ভিতরের হিংস্রভাবটা একটু প্রশমিত হতে পারে। সবসময় নিজেকে বা নিজের জাত-ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবার রোগটা প্রশ্রয় পায় না। একটা দুষমণ খাঁড়া করে নেওয়ার অভ্যাসটাও প্রশ্রয় পায় না। সব ছেড়ে 'গরু' নিয়ে তেড়ে যাওয়ার মনটার পালে বাতাস যতই দেওয়া হোক, নিজেকে একটু সংযত করার চেষ্টা করা যায়।

'গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণা করতে হবে' পোস্টারটা দেখে একজন নিত্যযাত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেই ফেললেন, মানুষ থাকতে গরু কেন?

মার্ক্সের 'পুঁজি' নিয়ে দু-দিন ব্যাপী আলোচনা

অমিত রায়চৌধুরি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর •

প্রতিদিন পুঁজি আরও প্রবলভাবে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে, এটা যেমন বিভিন্ন বাস্তব ঘটনাবলী থেকে আমরা অনুভব করি, তেমনি পুঁজিবিরোধী শক্তিও স্বল্পমাত্রায় আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার কথা ভাবছে বা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। এটা কিছু কিছু ঘটনার মধ্যে সামনে আসে। এইরকম একটা ঘটনা — একজন জার্মান অধ্যাপকের কলকাতায় এসে প্রায় দু-দিন কিছু বামপন্থী কর্মী ও বুদ্ধিজীবীর সামনে মার্ক্সের ক্যাপিটাল নিয়ে আলোচনা করা। বহুল পরিচিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মাইকেল হাইনবার্গ কলকাতায় রিপন স্ট্রীটের ক্রান্তি প্রেস অডিটোরিয়ামে গত ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর সারাদিন ধরে (সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা), মার্ক্সের পুঁজি গ্রন্থের মূল বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করলেন। তার সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে এই বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা এবং তার পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন। আলোচনার শুরুতে উনি দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলেন — প্রথমত, জার্মান ভাষায় লেখার অর্থ ইংরেজি অনুবাদে সবসময় সঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়নি; দ্বিতীয়ত, মার্ক্স এঙ্গেলসের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় বটে, তবে পুঁজির বিশ্লেষণে একটি নির্দিষ্ট গভীরতার পরে তাঁদের মতের ভিন্নতা ছিল, এটা মার্ক্সের মূল খসড়াগুলি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রথম দিন উনি ক্যাপিটালের মূল তাত্ত্বিক বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেন। দ্বিতীয় দিনে বড়ো অংশ জুড়ে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিশ্লেষণে মার্ক্সের লেখার প্রাসঙ্গিকতা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। প্রায় পঁয়ষট্টিজন শ্রোতা প্রবল আগ্রহ নিয়ে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অত্যন্ত প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্যে ওই আলোচনাটি সংগঠিত হয়। জার্মানির রোজা লুক্সেমবার্গ ফাউন্ডেশন নামক একটি সংস্থা এই অধ্যাপকের যাতায়াত ইত্যাদির খরচ বহন করার দায়িত্ব নেয়। সেন্টার ফর মার্ক্সিস্ট স্টাডিজ এই ব্যাপারে সাহায্য করে। এনটিইউআই নামক একটি সংগঠন এই আলোচনা সভা সংগঠনে উদ্যোগ নিয়েছিল এখানে।

দু-দিন আলোচনার শেষে উদ্যোক্তারা এবং উপস্থিত শ্রোতারা ভবিষ্যতে এরকম গঠনমূলক উদ্যোগ আরও বেশি বেশি করে হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। এই ব্যাপারে আরও প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে ইমেল-এ যোগাযোগ করতে পারেন : bodhisatwa.ray@gmail.com

মনসান্টোর দুনিয়াদারি

২১ সেপ্টেম্বর, জিতেন নন্দী, কলকাতা •

আজ দুপুরে ডিআরসিএসসি নামক এক সংস্থার আয়োজনে একটা তথ্যচিত্র দেখলাম। বেশ লম্বা একটা ধারাবিবরণ, কীভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে পৃথিবীময় একটা ধ্বংসযজ্ঞ করে চলল একটা কোম্পানি — মনসান্টো। ২০০৮ সালে মেরি মনিক রবিন এই ছবিটা তৈরি করেছিলেন। টানা তিনবছর দেশে দেশে ঘুরে তিনি মনসান্টোর দুনিয়াদারি প্রত্যক্ষ করেন। আমাদের ভারতেও এসেছিলেন। এরপর তিনি 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকর্ডিং টু মনসান্টো' নামে একটি বই ও একটি তথচিত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে এর ভাষা ছিল ফরাসি, পরে অন্যান্য ভাষায় তা অনুবাদ করা হয়।

মনসান্টোর দুনিয়াদারি শুরু হয়েছিল আমেরিকায় ১৯০১ সালে। আজ পৃথিবীর ৪৮টা দেশে তার উপস্থিতি। আমাদের চিরাচরিত চাষআবাদ, পশুপালন এবং খাদ্যাভ্যাসের ওপর মনসান্টোর প্রচণ্ড প্রভাব নিয়ে গোটা পৃথিবী আজ শঙ্কিত।

সয়াবিনের ওপর গর্জে উঠল বন্দুক

রাউন্ডআপ রেডি সয়াবিন হল এমন এক ব্র্যান্ডের সয়াবিন যার জার্মপ্লাজমের মধ্যে মনসান্টোর বিজ্ঞানীরা জিন-বন্দুকের সাহায্যে নানা জেনেটিক উপাদান ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে এই সয়াবিন বিক্রির অনুমোদন পায়, ১৯৯৭ সালে উরুগুয়ে, ১৯৯৮ সালে মেক্সিকো ও ব্রাজিলে এবং ২০০১ সালে আফ্রিকার বাজারে তা বৈধতা পায়। এই সয়াবিন খাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।

সিনেমাটা দেখতে দেখতে প্রশ্ন জাগে, জানি না, ভারতে আমরা যে নিউট্রিলা, নিউট্রি-নাগেট ইত্যাদি সয়াবিনের বড়ি খাই কিংবা সয়াবিনের তেল দিয়ে রান্না করি, তা ওই জাতের সয়াবিন কিনা।

দূষিত পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (পিসিবি)

মনসান্টোর তৈরি ও বিক্রি করা বহু জিনিস এখন পৃথিবীর বহু দেশে নিষিদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পজগতে যত পিসিবি ব্যবহার হত, তার ৯৯% সরবরাহ করত মনসান্টো। ১৯৭৭ সালে তার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এই ভয়ঙ্কর জৈব দূষণকারী বস্তুটা মানুষ সহ যে কোনো প্রাণীর শরীরে ক্যানসার রোগের জন্ম দেয়। অতীতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রান্সফর্মার ও ক্যাপাসিটর তৈরির জন্য, ইলেক্ট্রিক তারের পিভিসি কোটিংয়ের জন্য এই পিসিবির বহুল ব্যবহার ছিল। কিন্তু তা খুবই বিষাক্ত একটা জিনিস। ১৯৭৯ সালে মার্কিন কংগ্রেস এবং ২০০১ সালে স্টকহোম কনভেনশন অন পার্সিস্টেন্ট অর্গানিক পলিউটান্টস পিসিবি উৎপাদন নিষিদ্ধ করে।

গরুর দুধের উৎপাদন বাড়াতে rBST ইঞ্জেকশন প্রয়োগ

বোভাইন সমাটোট্রপিন (সংক্ষেপে BST) অথবা বোভাইন গ্রোথ হরমোন (সংক্ষেপে BGH) হল এক ধরনের পেপটাইড হরমোন, গরুর পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে জিনেনটেক নামে এক বায়োটেক কোম্পানি এর জিন আবিষ্কার করে এবং তার পেটেন্ট নেয়। এর ফলে কৃত্রিম উপায়ে rBST অথবা rBGH তৈরি করা সম্ভব হয়। মনসান্টো সমেত চারটে ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে rBST প্রোডাক্ট তৈরি করে মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে অনুমোদন চায়। মনসান্টো প্রথমে এর অনুমোদন পায়। পরে মেক্সিকো, ব্রাজিল, ভারত, রাশিয়া এবং আরও দশটি দেশ এর বাণিজ্যিক অনুমোদন পায়। কিন্তু কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ইসরায়েল এবং সমস্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর বাজারে এটা ঢুকতে পারেনি। আমেরিকায় জনমতের চাপে কিছু ব্যবসায়ী সংস্থা দুধের বিক্রির সময় rBST-ফ্রি লেবেল লাগাতে বাধ্য হয়।

সিনেমার পর্দায় এসব দেখে ভয় পাই, আমাদের ছেলেমেয়েরা যে চকোলেট-ক্যাডবেরি ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে, তার মধ্যেও তো দুধ থাকে। সেই দুধ কি rBST-মুক্ত?

কিছু দিক্‌পাল চরিত্র

সিনেমায় উঠে এল কিছু দিক্‌পাল মানুষের ছবি ও কথা।

ড্যান গ্লিকম্যান নামে এক মার্কিন ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ ১৯৯৫ থেকে ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ এগ্রিকালচার হিসেবে কাজ করেন। খাদ্যশস্য ও ওষুধের জিনগত পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে আলোকপাত করেন জেম্‌স মারিয়ানস্কি। তিনি ছিলেন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স সেন্টার ফর ফুড সেফটি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন-এর বায়োটেকনোলজি কো-অর্ডিনেটর। ১৯৭৭ সালে তিনি এই কাজ শুরু করেন। বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত নীতিসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সংযোগকারীর ভূমিকা নেন।

মাইকেল টেলর হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ডেপুটি কমিশনার ফর ফুড্‌স। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে তিনি মনসান্টোর পাবলিক পলিসি বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কাজ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য-রাজনীতির মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন এই মানুষগুলো।

ড. স্যামুয়েল এস এপস্টাইন একজন চিকিৎসক। ক্যানসার রোগের যেসব কারণ রোধ করা যায়, তা নিয়ে তিনি অমূল্য কাজ করেছেন। দুধে rBST-র মতো গ্রোথ হরমোনের প্রভাব নিয়ে তাঁর লেখা মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সমালোচনার মুখে পড়ে। কোনো খাবার বাজারে বিক্রি করলে তার গায়ে লেবেল সাঁটার প্রসঙ্গ মনসান্টোর মতো সংস্থাকে অস্বস্তিতে ফেলে।

রবার্ট বি শ্যাপিরো নামে এক মার্কিন ধনী ব্যবসায়ী ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মনসান্টোর পরিচালন-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

ঘূর্ণায়মান দরজার কেরামতি

মনসান্টোর যাবতীয় কুকীর্তির সাফাই দেওয়ার কাজ করেছে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতো সরকারি বিভাগ। সেই কুকীর্তি যখন নানাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন একটা রসিকতা শোনা যায়, সরকারের সঙ্গে মনসান্টোর 'রিভল্ভিং ডোর', যে ঘূর্ণায়মান দরজার একদিক দিয়ে ঢুকে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। যখনই মনসান্টোর জেনেটিকালি মডিফায়েড দুধ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, সরকার সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় আর মিডিয়া প্রচার করে, সেই দুধ নিরাপদ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মনসান্টোর অপরাধ ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। স্টিভেন এম ড্রুকার নামে একজন আইনজ্ঞ জনসমক্ষে প্রমাণ করে দেন, জিন পরিবর্তিত খাদ্য (জেনেটিকালি ইঞ্জিনিয়ার্ড ফুড) সম্পর্কিত মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নীতি বিজ্ঞান ও মার্কিন আইনকে লঙ্ঘন করে চলেছে।

দেখা গেছে, এরকম বহু ব্যক্তি, যাঁরা মার্কিন পরিবেশ দপ্তর, ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সুপ্রিম কোর্টের মতো রাষ্ট্রীয় কর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা মনসান্টোতেও কোনোসময় উচ্চপদে কাজ করেছেন।

জিএম ফুড ব্যাপারটা কী?

মনসান্টো এবং বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি বোঝানোর চেষ্টা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হল এক ধরনের মামুলি প্রজনন করার পদ্ধতি। বিভিন্ন দেশের সরকার এইভাবে প্রস্তুত খাদ্য (জিএম ফুড) কতখানি নিরাপদ, তা খতিয়ে দেখতে চায় না। কিন্তু চিরাচরিত প্রজননের পদ্ধতি থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। জেনেটিকালি ইঞ্জিনিয়ার্ড উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্যে দিয়ে জিনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা নষ্ট হয়ে যায় এবং তা কোনোভাবেই নিরাপদ নয়।

আর্পাড পুস্‌তজাই জিএম আলু নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পান, পরীক্ষাগারে ইঁদুরের দেহে তা প্রয়োগ করে খারাপ ফল পাওয়া যাচ্ছে। তাঁকে তাঁর সংস্থা, স্কটল্যান্ডের রোয়েট ইন্সটিটিউট সাসপেন্ড করে এবং তাঁর সেই ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই কুকর্মে মিডিয়া হাত মেলায়। কিন্তু এটা জানতে পেরে ইউরোপ ও আমেরিকার ২১ জন বিজ্ঞানী ১৯৯৯ সালে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

১৯৯০-এর দশকের শেষ এবং ২০০০-এর গোড়ার দিকে যখন ভারতে ঋণগ্রস্ত তুলাচাষিদের আত্মহত্যা সকলের নজরে এল, দেখা গেল কাঠগড়ায় রয়েছে মনসান্টোর জিএম তুলা বীজ। অধিক ফলনের আশায় বুক বেঁধে চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

যে মার্কিন চাষিসমাজ মনসান্টোর উৎপাদিত বস্তু ব্যাপকভাবে চাষে ব্যবহার করেছে, শেষপর্যন্ত তারাই মনসান্টোর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলল।

'রাষ্ট্র-নির্ভর অধিকার থেকে বেরিয়ে অন্য একটা ধারণা গড়ে তোলা যায় কি না ভাবতে হবে'

শমিত, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর •

'আমি রাষ্ট্র অনুগত হলে অধিকার পাব। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না থাকলে অধিকার খর্ব হবে আমার। অধিকারের ধারণা বদলাচ্ছে।' শহীদ শচীন সেন স্মরণে এক বক্তৃতায় এমন ধারণার কথা উঠে এল গণ আন্দোলনের অগ্রনী কর্মী শুভেন্দু দাশগুপ্তের বক্তব্যে। শাসকের অধিকার, শাসিতের অধিকার একটি বিরোধের সন্ধান — এই বিষয়ে বলতে গিয়ে শুভেন্দুবাবু জানান, রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার স্বীকার করছে, রাজনীতির অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার স্বীকার করেছে, আবার মানছে না। রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্ক বদলাচ্ছে এখন পুঁজি-নাগরিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে। নাগরিক অধিকার খর্ব করে নতুন নতুন আইন পাশ হচ্ছে — ইউ.এ.পি.এ, আফস্পা। নাগরিকের অর্থনৈতিক দায়িত্ব রাষ্ট্র আর নিজের কাঁধে রাখতে চাইছে না। এগুলো এখন দেবে পুঁজি। রাষ্ট্র ও পুঁজির যৌথ উদ্যোগ বদলাচ্ছে, এখন শুধুই পুঁজির উদ্যোগ। রাষ্ট্রের আইনে বলা ছিল, আদিবাসীদের জমি রাষ্ট্র দখল করতে পারবে না। 'বীজ আইন' কৃষকের বীজের অধিকার খর্ব করল। নদী, পর্বত, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য — এসব নাগরিক অধিকার এখন পুঁজি দখল করল। আদিবাসীদের জমি দখল করতে নামল। রাষ্ট্র 'পুঁজি'র অধিকার স্থাপন করে দিল। রাজনৈতিক ধারণা যেটা ছিল, তা অর্থনৈতিক ধারণায় বদলিয়ে গেল। এখন 'খাদ্য সুরক্ষা আইন', 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন' — নাগরিকের অধিকার আর নয়। তা আইনে পর্যবসিত হল। অধিকারের ধারণাটা রাষ্ট্রনির্ভরতা ছেড়ে পুঁজি নির্ভরতায় পাল্টে গেল। রাষ্ট্রনির্ভর নাগরিক অধিকার থেকে বেরিয়ে অন্য একটা ধারণা গড়ে তোলা যায় কি না, তা ভাবার অবকাশ আছে।

বক্তৃতার আগে শহিদ শচীন সেনের স্মৃতিচারণ করেন বাম আন্দোলনের কর্মী সন্তোষ রাণা, কৌশিক ও শচীন সেনের বড়ো ছেলে মিহির সেন। কবিতাপাঠ করেন সৃজন সেন ও কিশোর চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌতম সেন। শচীন সেনের পরিবারের পক্ষ থেকে 'শহিদ শচীন সেন স্মরণে' একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এদিন। সম্পাদনা করেছেন গৌতম সেন। পুস্তিকাটি সকলের মধ্যে বিতরিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই কলকাতা পুলিশ শচীন সেনকে গ্রেফতার করে। তাঁর অপরাধ ছিল নকশাল আন্দোলনের সমর্থক হওয়া।

১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর শচীন সেন এনআরএস হাসপাতালে শহিদ হন। নকশাল রাজনীতির বহু গোপন তথ্য তাঁর জানা থাকলেও পুলিশি অত্যাচারে তা প্রকাশিত হয়ে পড়েনি তাঁর কাছ থেকে। এবছরটা শহীদ শচীন সেনের শতবর্ষ।

সংবাদ সংলাপ

মানুষেরা কত নিষ্ঠুর না?

২০০৮ সালের আগস্টে সংবাদমন্থনের চলার শুরু হয়েছিল। শুরুতে এমন একটা ভাবনা উঠে এসেছিল যে, একটা রোজকার সংলাপ, একটা যথার্থ সংযোগ গড়ে তোলা হবে। একদিকে সংবাদমন্থন — সাংবাদিক সম্পাদক, অপরদিকে পাঠক পাঠিকা — এমনতরো বিভাজনের পারাপারে দাঁড়িয়ে প্রতিবেদন আর পাঠ প্রতিক্রিয়া নয়, বরং আমাদের চারপাশের জীবনজগৎকে যে নাড়াঘাঁটা, যে তোলপাড়, যে মন্থন আমাদের রোজকার জীবনের অঙ্গ, তাই বলা-কওয়া-লেখা-পড়ার আওতায় আনা। এভাবেই চলতে ফিরতে পথে ঘাটে পাড়ায় যে বিভিন্ন অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, তার সাথে যোগ হতে পারে, আরও অনেকের বলা, না বলা কথা। এরই খানিকটা প্রকাশ হবে, সংবাদমন্থনের দ্বিতীয় পাতায়, এই সংবাদ সংলাপ অংশে। আর আমরা যদি নিয়মিত বলা-কওয়া-লেখাটা চালিয়ে যাই, তবেই এটা নিয়মিত হবে।

১ সেপ্টেম্বর আহেলির 'আমার ডুয়ার্স ভ্রমণ' লেখাটা পড়ে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের সোমনাথ পরবর্তীতে তাকে বক্সা থেকে চার কিমি পায়ে হাঁটা পথে লেপচাখা যেতে বলেছে।

আর নদিয়ার মদনপুরের সম্রাট সরকার লিখেছে, 'আমিও এই বছর শীতের শেষে চিলাপাতা গেছিলাম। যে গাছটার কথা লিখেছ তার নাম 'রামগুণ' যত দূর মনে পড়ছে। কিন্তু তোমাদের সামনে কেউ গাছটার গায়ে কোপ মেরেছে শুনে খুব খারাপ লাগল। গাছটায় এখন 'টাচ' করা পর্যন্ত মানা। পর্যটকেরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দুটো গাছকে মেরে ফেলেছে। আর নতুন চারা কেউ তৈরিও করতে পারছে না। আমরা মানুষেরা কত নিষ্ঠুর না? চিলাপাতার জঙ্গল এখনও বেশ ঘন। জলদাপাড়া বা গরুমারার তুলনায়। কতদিন থাকবে জানি না। তুমি পাখি দেখতে ভালোবাসলে চিলাপাতার মতো জায়গা হয় না।'

১৬ আগস্ট, রঞ্জনের 'বেলঘরিয়ার সমাজকর্মীদের ওপর চলছে নজরদারি আর পুলিশি হেনস্থা' খবরের প্রেক্ষিতে রঞ্জনের সাথে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে অনেকেরই। নজরে এসেছে, খবরে ছাপা হয়েছিল, '... সমাজকর্মীদের মাওবাদী আখ্যা দিয়ে জেলে হেনস্থা করেছে'। বাস্তবে ঘটনাটা হল — বেলঘরিয়াতে সমাজকর্মী কিংবা গণ আন্দোলনে যুক্ত এমন কারও হাজতবাস হয়নি। তবে জিজ্ঞাসার ছুতো করে থানায় এনে তিনঘন্টা আটকে অপমান করে গেছে পুলিশ। এই খবরটি এডিট করে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। মূল প্রতিবেদনটি অনেক বড়ো, তার বাদ দেওয়া অংশটির একাংশ পাঠকের জন্য নিচে দেওয়া হল, পূর্ণাঙ্গ লেখাটি সংবাদমন্থন ওয়েবসাইটে এডিটেড লেখাটির পরিবর্তে রেখে দেওয়া হচ্ছে, ঠিকানা http://bit.ly/1bnK2Z6

''মাওবাদী' তকমায় ডাক্তার বিনায়ক সেনকেও রাষ্ট্র জেল খাটিয়েছে। গত প্রায় তিনদশকের কাছাকাছি সময় ধরে এ দেশের কেন্দ্রীয় বা বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলো সামাজিক কিংবা সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলন বা প্রতিবাদে উদ্যোগী-উদ্যমী বহু মানুষকেই একইরকম কানুন ও কৌশলে দমন করার একটার পর একটা নজির গড়েই চলেছে। তা সেসব মানুষের গায়ে দলীয় রাজনীতির ছাপ থাক কিংবা নাই থাক।

... জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন ভারপ্রাপ্ত আইসি ওদের সামনেই বলে বসলেন, 'আপনাদের তো চিনি' ...। পুলিশ প্রশাসনই বা কেন? বেলঘরিয়ার বহু বাসিন্দা, স্টেশন এলাকায় যাদের কিছুটা নিয়মিত যাতায়াত, ছাত্র-যুব-বয়স্ক-বেকার, যারা গল্পশল্প করে, নানা পেশা-ব্যবসা করে, বেশিরভাগই চেনে মৃণাল-হিমাদ্রীকে। গত প্রায় দু-দশকের বেশি সময় ধরে সমাজের নানা স্তরে দুস্থ-পীড়িত সঙ্কটে নানাভাবে পাশে দাঁড়ানো — নাটক, গান, সাহিত্যের চর্চা — নিয়মিত রক্তদান শিবির চালানো থেকে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের সংগ্রাম, কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, ভাড়া ও দাম বাড়ার প্রতিবাদ থেকে নোনাডাঙার বস্তি উচ্ছেদ, দিল্লি বা কামদুনির প্রতিবাদে কখনও এলাকাতেই, কখনও আবার লড়াকু মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যেতে কে না দেখেছে ওদের?

... একেবারেই হালে চাপটা তৈরি হওয়া শুরু — রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কিছু উক্তি থেকেই — আর সেই চাপটা হিমাদ্রী বা মৃণালের মতো মানুষদের ওপরেই নয়, এসে পড়েছে সবরকম বেলঘরিয়াবাসীর ওপরেই — তা তিনি প্রতিবাদী হোন আর না-ই হোন। মেসের বাসিন্দা — ছাত্র যুব, স্টেশন চত্বরে সান্ধ্য আড্ডায়, চা-দোকানি — একটা ভয় উঁকি মারতে শুরু করল সবার মধ্যেই। যেহেতু মন্ত্রী মুখ খুলেছেন, আর তা এইভাবে, বেলঘরিয়াতে মাওবাদীরা ঢুকে পড়েছে, ঘাঁটি গেড়েছে ... মেসগুলোতে কারা থাকে? কী তাদের পরিচয়? স্টেশন চত্বরে চা-দোকানগুলোতে মাওবাদীরা আসে-যায়-যোগাযোগ করে। প্রাক্তন নকশালদের মদতেই এসব বেড়ে উঠছে ইত্যাদি ...। ...'

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, অনেক সময় স্থানাভাবে সংবাদ সম্পাদনা করার দরকার হয়, সেক্ষেত্রে অসম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ খবরটি থাকে ওয়েবসাইটে।

সংবাদমন্থনে প্রকাশিত যে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানান নিচের ঠিকানায় :
বঙ্কিম
কল্যাণগড়, অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
ফোন : 03216-238742,
ইমেল: manthansamayiki@gmail.com

সুন্দরবনের ধারে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র; বাংলাদেশে লং মার্চ, পশ্চিমবঙ্গে সই সংগ্রহ

ইন্দ্রনীল সাহা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর •

সুন্দরবন দুই বাংলা জুড়ে বিস্তৃত। প্রায় ৬০% বাংলাদেশে আর ৪০% পশ্চিমবঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই এপারে যেসব মাছ আসে তার অনেকাংশেরই জন্ম হয় বাংলাদেশের সুন্দরবনে। গত ২০০ বছরে সভ্যতার অগ্রগতির কোপ গিয়ে পড়েছে সুন্দরবনের উপরে। প্রায় ৬৬% বনভূমি আজ লুপ্ত। এই আক্রান্ত বনভূমির উপর আজ নতুন আক্রমণ, বাংলাদেশের দিকে ঘোষিত বনভূমির মাত্র ১৪ কিমি দূরে ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে তৈরি হতে চলেছে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এক বিশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পুরো পরিকল্পনা অনুসারে অধিগৃহীত ১৮৩৭ একর জমিতে দুই ধাপে তৈরি হবে মোট ২৬৪০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্রথম ধাপে তৈরি হবে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি ইউনিট। সময় ধার্য করা হয়েছে সাড়ে চার বছর। পুরো কাজটি হবে ভারতের এনটিপিসি এবং বাংলাদেশের বিপিডিবি-র যৌথ উদ্যোগে। ২০১৩ সালের ২০ এপ্রিল এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে ঢাকাতে। সরকারি আইন অনুযায়ী, এই ধরনের প্রকল্পের জন্য যে কোনোরকম কাজ শুরু হবার আগেই পরিবেশগত সমীক্ষা (ইআইএ) ও তার ছাড়পত্র পাওয়া আবশ্যিক। এক্ষেত্রে কিন্তু প্রকল্পের স্থান চূড়ান্তকরণ ও জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি যাবতীয় কাজ শেষ হওয়ার পর কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করা ও তার জন্য জনসাধারণের কাছে মতামত চাওয়া হয়। এই তামাশার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। অর্থাৎ, অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলিকে হয় সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে নয়তো বিভ্রান্তিকর উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫ লাখ মানুষের রুটি রুজি, ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে নেড়া বনভূমি, ৬৩,৬৩৮ টন ধান, ৫৭৮৭ মেট্রিক টন মাছ এবং নগদ বার্ষিক ৫০০০ কোটি টাকার সম্পদের বিনিময়ে পাওয়া যাবে বিদ্যুৎ। এই প্রকল্পের প্রতিবাদে জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে ঢাকা থেকে সুন্দরবন এক বিশাল লং মার্চে অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য, লং-মার্চ করে প্রকল্প আটকে দেওয়ার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে ফুলবাড়িতে।

এদিকে এপার বাংলাতেও গড়ে উঠছে প্রতিবাদ। ইন্টারনেটে একটি পিটিশন করা হয়েছে। সই সংগ্রহ করা হচ্ছে ইন্টারনেটের বাইরেও। অনলাইন ও সংগৃহীত সই সহ সম্পূর্ণ পিটিশনটি দেওয়া হবে এনটিপিসির কলকাতা অফিসে ২৭ সেপ্টেম্বর। উদ্যোগ বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন ও পত্রপত্রিকার। একটাই কথা দুই দেশের সরকারকে সবাই বলতে চাইছেন, 'বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে, সুন্দরবণের কোনো বিকল্প নাই'।

পরের কথা : ২৭ তারিখ কলকাতায় এনটিপিসি-র অফিসে কয়েক হাজার মানুষের সই করা পিটিশনটি জমা দিতে গেলে, সেখানকার কর্মচারীরা জানায়, দায়িত্বপূর্ণ কেউ এখন অফিসে নেই, তাই পিটিশনটি গ্রহণ করা হবে না। পরে স্বাক্ষরকারীদের প্রতিনিধিরা পিটিশনটি রিসেপশনে দিতে গেলে এনটিপিসি সেখানেও তা জমা নিতে অস্বীকার করে এবং বলপ্রয়োগ করে আবেদনকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

আর বাংলাদেশের লং-মার্চ ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাকা প্রেস ক্লাব থেকে রওনা হয়ে সাভার, রানা প্লাজা, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ, গোয়ালন্দ, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কালিগঞ্জ, যশোর, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, দৌলতপুর, খুলনা, বাগেরহাট, গৌরম্ভা বাজার, চুলকাঠি হয়ে পাঁচ দিনে চারশো কিলোমিটার অতিক্রম করে ২৮ সেপ্টেম্বর বিকালে বৃহত্তর সুন্দরবনের দিগরাজে উপস্থিত হয়। সুন্দরবন রক্ষাসহ সাত দফা দাবি আদায়ের এই লং মার্চ চলাকালীন বহু লক্ষ মানুষ রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে একাত্মতা প্রকাশ করে। লং মার্চে অংশ নেয় বাংলাদেশের সকল শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিত্বকারী মানুষ।

ধর্ষণের শিকার মোড়াঘাট চা বাগানের মেয়েটি আজ একমাস পরেও নির্বাক

প্রদীপন, শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর •

মোড়াঘাট চা বাগান হল বানারহাট ব্লকে। ২৭ আগস্ট ওখানে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। একটি মেয়ে বাজার করে ফিরছিল, বৃষ্টি পড়ছিল। সে একটি লোককে বলে, বাড়ি অবধি ছেড়ে দিয়ে আসতে। লোকটি ওই এলাকায় ছাতা মেরামত করত। সে বলে, একটু জামা পরিবর্তন করে আসছে। সেই সময় ওই রাস্তায় মোটর সাইকেল নিয়ে কয়েকজন আসে এবং তারা মেয়েটিকে লিফট দিতে চায়। তারপর তারা যেখানে নতুন হিন্দি কলেজ হচ্ছে, সেখানে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে।

অকুস্থলে গিয়ে জানা গেল, বাগানের অধিবাসী ও চা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা বলছে, ছাতা মেরামতকারী লোকটি নির্দোষ। সেই পুলিশ ও বাগানের শ্রমিকদের খবর দিয়েছিল। কিন্তু তাকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অবশ্য কারোর মতে ওই ছাতা সারাইকারীর গায়ে কাদার দাগ পাওয়া গেছে, সে জামা পরে ফিরে এসে মেয়েটিকে না দেখে বাড়ি ফিরে গেল না কেন?

ওখানকার বাগানের লোকেরা বলছে, ছাতা সারাইওয়ালা দোষী নয়। আসল অপরাধীদের ধরার জন্য মহিলারা থানা ঘেরাও করেছিল। ডেপুটেশনের বয়ানে ছিল, প্রকৃত দোষীদের পুলিশ আড়াল করছে।

মেয়েটি একমাস পরে এখনও সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। সে নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রয়েছে। আজ ওর বাবা বলল, সে এখনও কথা বলছে না। মোরাঘাট চা বাগানের লোকেদের দাবি, নিয়মিত মেডিক্যাল বুলেটিন দিয়ে মেয়েটির শারীরিক অবস্থার বর্ণনা করা হোক, যেমন দিল্লির ধর্ষণের ঘটনায় করা হয়েছিল। লোকে জানুক, মেয়ে কেমন আছে। আর অন্য যারা এই ঘটনায় যুক্ত, তাদের গ্রেফতার করা হোক। পুলিশ এখনও চার্জশিট দেয়নি। পুলিশের বক্তব্য, মেয়েটি যেহেতু কথা বলতে পারছে না, তাই চার্জশিট দেওয়া যাচ্ছে না।

গ্রামে যখন প্রশাসন থেকে টাকা ও চাল দেওয়ার জন্য এসেছিল, তখন কামদুনির উদাহরণ টেনে স্থানীয়রা বলছে, ক্ষতিপূরণের দরকার নেই, বিচার চাই।

নয়া ওষুধ অনুমোদনে কোম্পানি, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের চক্র কাজ করছে

ডঃ সায়ন্তন ব্যানার্জি ও ডঃ জয়িতা ভৌমিক, মৌলানা আজাদ মেডিকাল কলেজ •

পোশাকি নাম 'ড্রাগ ট্রায়াল', এর মাধ্যমে নতুন ওষুধ বাজারজাত করার ছাড় মেলে। যাদের শরীরে এই পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, তারা এ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ডাক্তারবাবুর প্রতি রোগীর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে, তার শরীরটাকে ড্রাগ ট্রায়ালে ব্যবহার করা হয়।

২০১২ সালের মে মাসে পার্লামেন্টের দুই কক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির তৈরি 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন'-এর কার্যধারার ওপর রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন'-এর ঘোষিত লক্ষ্য হল, 'ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রির আকাঙ্ক্ষা, দাবি ও চাহিদা পূরণ করা'। নতুন ড্রাগ বা ওষুধ সরকারি অনুমোদনের ক্ষেত্রে এই রিপোর্টে অসঙ্গতির কথা উঠে এসেছে। এই অনুমোদন দেন 'ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া' বা ডিসিজিআই। দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ নতুন ওষুধের জন্য বিশেষজ্ঞের সুপারিশ তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা তথ্য ছাড়াই এসেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের বিশেষজ্ঞের সুপারিশের বয়ান হুবহু এক, টুকে দেওয়া। পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি এই রিপোর্টে মন্তব্য করেছে, এই সুপারিশগুলির পিছনে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের কোনো 'অদৃশ্য হাত' রয়েছে। এ ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

'কোনো প্রার্থীই আমার পছন্দের নয়' — ভোট মেশিনে বোতাম রাখতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৯ সেপ্টেম্বর •

এতদিন আইনে ছিল, একজন ভোটার যদি কোনো প্রার্থীকেই যোগ্য হিসেবে না মনে করে, সে বুথে গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে একটি ফর্ম চেয়ে তা পূরণ করে সেকথা জানাবে। কিন্তু এতে নির্বাচকের নির্বাচনের গোপনীয়তা রক্ষা হয় না। তাই এর বদলে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে না-ভোটের একটি বোতাম রাখলে (বা ব্যালট পেপারে এই মর্মে একটি সারি রাখলে) নির্বাচকের গোপনীয়তা রক্ষা পায়। এই মর্মে একটি পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছিল পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ-এর (পিইউসিএল) তরফে। সরকারের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করে বলা হয়েছিল, ভোট দেওয়া তো আমাদের সংবিধান অনুযায়ী মানুষের মৌলিক অধিকার নয়, সাংবিধানিক অধিকার। তাই এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি (২৭ সেপ্টেম্বর) রায় দিয়েছে, ইলেকশন কমিশন ব্যালট পেপারে বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে একদম নিচের সারিতে একটি না-ভোট (ওপরের কেউ নয়) বোতাম রাখুক। সুপ্রিম কোর্টের আশা, এতে মানুষের ভোট দিতে আসার হার বাড়বে, ভোট চুরি কমবে এবং রাজনৈতিক দলগুলিও জনগণের বিরক্তির আঁচ পেয়ে যোগ্য প্রার্থী দেবে।

আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক — জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রীয় সরকার

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৭ সেপ্টেম্বর •

এই কার্ডকে আইনসঙ্গত করার জন্য একটি বিল সেই ২০১০ সাল থেকে আটকে আছে পার্লামেন্টে। ওই 'ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া বিল ২০১০' প্রত্যাখ্যাত হয়েছে পার্লামেন্টের ফিনান্স বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। তার ওপর, এই কার্ডে যে চোখের মনির ছাপ, হাতের আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে, তা সংবিধানে গোপনীয়তার স্বীকৃত অধিকারের পরিপন্থী। তাই একে লাগু করতে গেলে সংসদের অনুমোদন পেতে হয়, প্রশাসনিক ভাবে একে লাগু করা যায় না। এছাড়াও, আধার কার্ড ঢালাওভাবে বিলি করার মাধ্যমে, যারা অন্য দেশ থেকে বেআইনিভাবে এদেশে এসে রয়েছে, তারাও এই কার্ডধারী হয়ে উঠছে, যা ১৯৫১ সালের নাগরিকত্ব আইনের পরিপন্থী — এইসব কথা বলেই সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক পুত্তাস্বামী।

এই জনস্বার্থ মামলার ওপর সুপ্রিম কোর্টের বিএস চৌহান ও এসএ বোদবে ২৩ সেপ্টেম্বর রায় দেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক করতে পারবে না কোনোভাবেই। পরে ভারত সরকার এই রায় সমর্থন করে।

উল্লেখ্য, এই কার্ড করানোর জন্য এখনও অবধি ৫০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে।

সাইকেল সমাজের প্রতিবাদী স্বাক্ষর সংগ্রহ

কলকাতায় ১৭৪টি রাস্তায় সাইকেল নিষেধের প্রতিবাদে এবং এই আইন তুলে নেওয়ার দাবিতে প্রকাশ্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান হলো উল্টোডাঙা সংলগ্ন বাগমারি বাজারে, ২২ সেপ্টেম্বর। প্রতিবেদক শমীক সরকার, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর •

গুজরাতে মিঠি ভিরদি পরমাণু প্রকল্পের জন্য ভারত-মার্কিন সমঝোতা, প্রতিবাদ

ভাবনগরে জেলাশাসকের দপ্তরের কাছে প্রতিবাদ সমাবেশ, ২৩ সেপ্টেম্বর

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৯ সেপ্টেম্বর •

গুজরাটের ভাবনগরে মিঠি ভিরদি পরমাণু প্রকল্পের জন্য এখনও জমি অধিগ্রহণটুকু হয়নি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমেরিকা সফরের সময় এনপিসিআইএল (ভারতের পরমাণু কর্তৃপক্ষ) এবং মার্কিন পরমাণু চুল্লি কর্পোরেট ওয়েস্টিংহাউসের মধ্যে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল ২৭ সেপ্টেম্বর। এই অন্যায় চুক্তি বন্ধ ও বাতিলের দাবিতে ভাবনগর জেলার মিঠি ভিরদি এলাকার হাজার হাজার গ্রামবাসী প্রতিবাদ জানাল প্রকাশ্যে, ২৩ সেপ্টেম্বর। ভাবনগর জেলাশাসকের কাছে প্রকাশ্য সভা করে ডেপুটেশন দিল মিঠি ভিরদি, জাসপাড়া, খাদারপাড়, মান্ডবা, পানিয়ালি, সসিয়া, কানতালা, প্রভৃতি গ্রামের মানুষরা। ডেপুটেশনের সাথেই ২৮১টি এফিটেভিটও জমা দেওয়া হয়। এই এফিটেভিটগুলিতে চাষের জমির মালিকরা জানায়, এই পরমাণু চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জমি অধিগ্রহণের যে চক্রান্ত করছে এনপিসিআইএল, তারা এর চূড়ান্ত বিরোধিতা করছে। এনপিসিআইএল বা সরকার যে দামই দিক না কেন, তারা তাদের জমি বেচতে রাজি নয়।

এই ডেপুটেশনে সই করে সাতটি গ্রামের সরপঞ্চ।

এই চুক্তি বন্ধ ও বাতিলের দাবিতে এবং কোথাও-ই পরমাণু প্রকল্প না করার আবেদন করে পশ্চিমবঙ্গ ও আমেরিকার ৩৩ জন ২২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে একটি চিঠি পাঠায়। পরে ২৭ সেপ্টেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের দিন দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যে অবধি কলেজ স্কোয়ারে একটি গণ অবস্থানের মাধ্যমে আরও ৮০টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মনোজ কুমার পাল, সুজয় বসু, শান্তনু চক্রবর্তী, মিহির চক্রবর্তী, স্টিফেন মাইকসেল, আনন্দ লি তান প্রমুখ। কলেজ স্কোয়ারে অবস্থানটি সংগঠিত হয় পারেজিয়া, মন্থন, আকিঞ্চন, নান্দীমুখ প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোগে।

পুরসভার মাসিক অধিবেশন জমে উঠল বিরোধী ও পরিচালকদের সওয়াল জবাবে

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর •

প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহে, শেষের দিকে, যেদিনই কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন হয়, বিরোধীরা টিএমসি পরিচালিত কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনে আক্রমণ শানায়। এ মাসেও তার ব্যতিক্রম হল না।

আধঘন্টার বেশি বৃষ্টি হলে মুক্তারাম বাবু বা ঠনঠনিয়া নয়, মহাত্মা গান্ধী রোডেও জল জমে থাকে, বিরোধী কাউন্সিলরদের অভিযোগের উত্তরে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্থানাভাবে নতুন পাম্প বসাতে না পারায় জমা জল দ্রুত সরাতে অসুবিধা হচ্ছে। তবে মহাত্মা গান্ধী রোডে জমা জল কেন বেরোয় না, তিনি খোঁজ নেবেন।

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে মেয়র জানান, কলকাতা পুরসভার অধীন পার্কগুলিতে বৃক্ষরোপন করার কোনো সুযোগ না থাকলেও তাঁরা উদ্ভিদ বিশারদদের সমীক্ষার জন্য নিয়োগ করেছেন। তাঁরাই পরামর্শ দেবেন, কী ধরনের গাছ লাগানো যায়।

বিরোধীরা অভিযোগ করে, পুরসভার অধীন অনেক পার্কে মালি নেই, নেই কোনো প্রহরী, নেই কোনো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। কাউন্সিলার রাজীব বিশ্বাসের অভিযোগ, ৩০ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার অনেকগুলি পার্ক হস্তান্তরিত হয়ে বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ হচ্ছে, কলকাতা পুরসভা নির্বিকার। কলকাতার রাস্তার ও পার্কের গাছ কাটা রোধে আইন থাকা সত্ত্বেও, শহর জুড়ে রাস্তার ধারে হোর্ডিং-ব্যানার লাগাবার জন্য গাছের ডাল কাটা হয়েছে। ২৭ নম্বর নারিকেলডাঙা মেন রোডে ১০০ বছরের পুরোনো বটগাছটি কেটে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের প্রত্যুত্তরে মেয়র পারিষদ দেবাশিষ কুমার বলেন, এই ব্যাপারটি (প্রহরী, মালি) আমার জানা ছিল না। খোঁজ খবর নিয়ে যা ব্যবস্থা নেবার নেব। পার্কে ও রাস্তার ধারে অবস্থিত এই গাছগুলির ডাল পুরসভার পক্ষ থেকে কাটা হয়নি, পুজো কমিটিগুলো ও স্থানীয় লোকেরা এই কাজ করেছে। ৩০ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের যে পার্ক ও খেলার মাঠগুলি এতদিন মানুষ ব্যবহার করেছে, সেই জমিগুলি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, জমির মালিকরা তাদের মালিকানা স্বত্বের দ্বারা বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করছে।

৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রীমতি দীপু দাস অভিযোগ করেন, পিকনিক গার্ডেনের ১ নম্বর বেদিয়াডাঙা মসজিদ বাড়ি লেনে ঘেরা সরকারি জমিতে ঘর তৈরি করে লোকে বসবাস করছে। উত্তরে মেয়র জানান, ওই জমিটি কলকাতা পুরসভা বা সরকারের নয়। দীপু দাস প্রতিবাদ করে বলেন, আমার কাছে দলিল ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র আছে, জমিটি সরকারের।

২৫ সেপ্টেম্বর মাসিক অধিবেশনের শুরুতে পুরসভার চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুরসভায় যারা ১০০ দিনের কাজ করে, তাদের মাথা পিছু দেড় হাজার টাকা বোনাস দেওয়ার ঘোষণা করেন। বিরোধীরা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, বোনাস না অনুদান, কোনটা দেওয়া হবে নির্দিষ্ট করে জানানো হোক। কারণ, উৎপাদনশীল শ্রমের কাজ ছাড়া বোনাস দেওয়া যায় না। মেয়র বলেন, এরা সবাই দুস্থ, দরিদ্র মানুষ, আপনারা বোনাস বা অনুদান যাই বলুন আমরা গতবছর এক হাজার টাকা দিয়েছি, এ বছর দেড় হাজার টাকা দেব।

কলকাতার রাস্তাগুলি মেরামত সম্পর্কে মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ আশ্বস্ত করে বলেন, পুজোর আগেই কলকাতার সব রাস্তা অ্যাসফলটাম দিয়ে সুন্দর করে মেরামত করা হবে, তার জন্য টাকার অভাব হবে না। এতদিন বৃষ্টির জন্য করা সম্ভব হয়নি।

কাউন্সিলার প্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, এক লরি নিকাশি মাটির পরিবর্তে আট লরির টোকেন নিয়েছে। এই ধরনের ৪৫৭৭টি ভুয়ো টোকেন দিয়ে টাকা নিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। মেয়র বলেন, এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত দুই ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাদের টাকা দেওয়া হয়নি। শাস্তিও দেওয়া হবে।

বিরোধীরা অভিযোগ করে, আজ পর্যন্ত পুরসভা কলকাতায় বসবাসকারীদের মধ্যে কারা দারিদ্র্যসীমার নিচে, তার তালিকা তৈরি করতে পারল না। পুরসভা এই কাজের দায়িত্ব কেন কাউন্সিলারদের দিচ্ছে না? মেয়র জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনে এই তালিকা তৈরি করতে হয়, খুব শীঘ্র তৈরি হয়ে যাবে।

বিরোধীরা আরও অভিযোগ করে, মেঘা, আনন্দধারা ইত্যাদি ৮টি সমবায় সংস্থা কয়েক বছর ধরে গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং ফি আদায় করে কলকাতা পুরসভাকে প্রাপ্য টাকা দেয়নি। মেয়র জবাব দেন, এই কয়েক কোটি টাকা অনাদায়ী রয়ে গেছে, কারণ এই আটটি সমবায় সংস্থার নাম, ঠিকানা সবকিছু ভুয়ো, তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি আছে আমাদের পাড়াখানি

মিত্রা চট্টোপাধ্যায়, সল্ট লেক, ৩১ আগস্ট •

'লাবনি স্কুল' — সল্টলেকের সবচেয়ে পুরোনো আবাসন 'লাবনি এস্টেট্'–এর অন্তর্গত। সরকারি পরিকাঠামো অনুসারে নতুন উপনগরী সল্টলেকের বাসিন্দাদের কথা ভেবেই আবাসনের সাথে এই স্কুল তৈরি হয় সেই সত্তর দশকে ছোটো শিশুদের জন্য।

সেই লাবনি স্কুলে উদ্‌যাপিত হল ভারতবর্ষের ৬৭তম স্বাধীনতা দিবস। অংশগ্রহণকারীরা ছিল ভারতের সবচেয়ে খুদে নাগরিক, নতুন প্রজন্মের কচিকাঁচারা। লাবনি স্কুল তৈরি হয়েছিল উপনগরীর মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের প্রয়োজনে কিন্তু এই উপনগরী আর মধ্যবিত্তের রইল না, উচ্চবিত্তের হল। উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদের প্রয়োজন হল ইংরাজি মাধ্যমের সুসজ্জিত স্কুল। তাদের প্রয়োজন মেটাতে তৈরি হল অনেক উচ্চবেতনের ইংরাজি স্কুল।

উপনগরীর উপকণ্ঠের গরিব বসতির বাসিন্দা, যারা পয়সার বিনিময়ে সেবা করে থাকে উপনগরীর মানুষদের, সেই সব কাঠের মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি, ড্রাইভার, রিক্সাচালকদের ছেলেমেয়েদের একটা বড়ো অংশ ভিড় জমাল লাবনি স্কুলে। সাধুবাদ জানাতে হয় লাবনি আবাসিক সমিতির সভ্যদের যারা সুযোগ করে দিল ওই শিশুদের সুস্থ পরিবেশে শিক্ষাদানের। কাছে টেনে নিলেন ওই শিশুদের। সুতরাং স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের অংশগ্রণকারীরা কেবল শিশুই নয় — ভারতের অতি কষ্ট-সহিষ্ণু শিশু এরা। দেশকে তারা চেনে তাদের আপন চক্ষু দিয়ে, নিজের লড়াইয়ের জায়গা থেকে।

তবু স্কুলে এসে তাদের পরিচয় ঘটে তাদের দেশের সাথে অন্যভাবে, বইয়ের পাতা থেকে বা তার ভালবাসার 'আন্টিদের' (শ্রেণী শিক্ষিকা) কাছে থেকে। শুধু বর্তমান দিয়ে নয়, অতীতের গল্প থেকেও। দেশের মহান মানুষদের গল্প শুনে, কবিদের কবিতায় বা গানে। ভালোবাসার বীজ বপনের অঙ্গীকার নিয়ে শ্রেণী শিক্ষিকারা শিশুমনে প্রভাব ফেলে।

এই ৬৭তম স্বাধীনতা দিবসে তারা শপথ নেয় গানে — পতাকা অভিবাদন করে।

চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই —
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে
... ...
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয় —
মুক্তির জয় বলো ভাই।

সারাবছর ধরে যে সশরীর চর্চা চলে তার নমুনা প্রদর্শন করে। জাতীয় পতাকার তিন রঙের গৌরবক্র ধরে রাখবে সেই তিন রঙা কাপড়ে বুকে বেঁধে ড্রিল ড্যান্স করে অপূর্ব ভঙ্গিমায়। ছন্দে তালে তারা নিখুঁত। সব শেষে ছিল ভারতে মূল সুর 'ঐকতান'কে ফুটিয়ে তুলতে নাচ গানের মেলবন্ধন। 'মিলে সুর মেরা তুমহারা / তো সুর বনে হামারা ...'। সবচেয়ে ছোটো শিশুরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পোশাকে সেজে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সেই 'ঐকতানের' অনুভবকে আরও গাঢ় এবং দৃঢ় করতে। গানের সুর, সংস্কৃতির সুর, প্রজ্ঞার সুর, রাজনীতির সুর সব মিলে প্রতি পদক্ষেপে তৈরি করে নতুন নতুন ভারত, জেগে ওঠে ভারত। না, চলা থামে না, শুধু পরিবর্তন হয়। ভারতবর্ষ যে কোনো একটা সুর নয়, ভারত সুরের ঐকতান, প্রজ্ঞার ঐকতান, সেই ভারতকে তারা প্রণাম জানায়।

দৈনন্দিন জীবনের দেখা থেকে, এ দেখা ভিন্ন, শিশুমন কতটা বোঝে বা বোঝে না সেটা বড়ো কথা নয়, এই স্মৃতি সুস্থ জীবনের, সুস্থ ভাবনার।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরেই ছিল আরও একটি আয়োজন — এক প্রদর্শনী। তাদের মাতৃসম শিক্ষিকারা কেমন করে নানা রকম আয়োজনের সাহায্যে তাদের পড়ান বা শেখান তার নানা নমুনা। সহজ পাঠে তারা পড়ে 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি আছে আমাদের পাড়াখানি / দিঘি তার মাঝখানটিতে, তালবন তারি চারি ভিতে'। সেই কবিতার সাথে মিল রেখে এক সুন্দর গ্রামের মডেল তৈরি হয়েছে। তাতে সাজান রেয়েছে গরুর গাড়ি, খড়ের চালের ঘর, গোয়াল ঘর আর পশুপাখি। সবই রয়েছে তাদের পাঠ্য পুস্তকে।

'বর্ণমালা' বানিয়েছে আদের 'আন্টি', অকারান্ত শব্দে রয়েছে 'বই', 'মই' — তাদের পাশে সত্যি ছোটো বই, মই।

ওরা পড়ে 'সাত সাগরের পারে, — পারিজাত বনে ...' আর আন্টিরা ছোটো ছোটো শিশুদের মুখের ছবি বসিয়ে তাদেরই আঙুলের ছাপে ফুল বানিয়ে তৈরি হয়েছে পারিজাত বন। বিভিন্ন রঙে চুবিয়ে তাদেরই ছোটো ছোটো হাতের ছাপ নিয়ে তাদের রঙ চেনানোর খেলা। চৌকো গোল, ত্রিকোণ, আয়তক্ষেত্র সব কাগজে কেটে তৈরি হয়েছে নিঃসর্গের ছবি, পাহাড়, ঘর, নৌকা, নদী কত কী!

চিড়িয়াখানা তৈরি হয়েছে। বন্য জন্তু আর গৃহপালিত জন্তু পড়েছে তারা বইতে। গ্রামের মধ্যে ছিল গৃহপালিত জন্তু আর চিড়িয়াখানায় বন্য জন্তু।

ছিল মন্দির, মসজিদ, গির্জা। ছিল অঙ্ক শেখার খেলা। পুরোনো জিনিস দিয়ে হাতে তৈরি পেনসিল বক্স, নিমন্ত্রণ কার্ড, ওয়াল হ্যাঙিগং, কিছুই যে ফেলা যায় না, এও তো শেখার। সারা বছরের ওদের হাতে কলমে সক্রিয় হবার ক্লাসের কত কাজও সাজানো ছিল। বাবা মায়েরা দেখে খুশিতে আপ্লুত। কত না পাওয়ার মধ্যে এটুকু তাদের পাওয়া, তাদের ছেলেমেয়েরা এ স্কুলে ভালো আছে। ভরসা ভালো থাকবে।

এদের তৈরি করে আনন্দে থাকেন শিক্ষিকারা। সুযোগ পেলে সব শিশুরই প্রত্যয় দৃঢ় হয়, প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যায় আজ তা বিশ্বাস করতে তাঁদের দ্বিধা নেই বরং তাঁরা তা করে দেখিয়ে দেন।

ভালো থাকুক শিশুরা, ভালো থাকুন তাদের শিক্ষিকারা।

চলতে চলতে

এই ভারী বর্ষায় আমাদের বাড়িটা ধসে পড়ল, আর ...

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর •

সদ্য-ছাড়া পুরোনো পাড়ার গলির মুখটা এখন বাঁশের খাঁচায় বন্দি। পুজোর একমাস আগে থেকেই এমন থাকে। গত ৬-৭ বছর ধরে আরও বেড়েছে পুজোর জাঁকজমক। এই পুজোয় ধুনো দেওয়ার দায়িত্ব এখন স্থানীয় বাঙালিদের হাত থেকে চলে গেছে নতুন আসা পয়সাওয়ালা অবাঙালি বাসিন্দাদের হাতে। ছোট্ট জায়গায় এত বড়ো করে পুজো দেখে ছোটোবেলায় রূপকথায় পড়া বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির কথা মনে পড়ে যায় — এমনটা বলেছিল ওপারের যদুবাবুর বাজারের এক রসিক সবজিওয়ালা।

পাড়ার ভিতরে ঢুকলে মনটা বেশ ঠান্ডা হয়ে যায়। সরু গলির মধ্যে এক চিলতে হাওয়া; তবু একান্ন বছরের পরিচিত বাতাস। জ্ঞান হওয়া থেকে বড়ো হয়ে ওঠার সমস্ত সময়টা এখানেই ছিলাম। এই রাস্তাটার প্রতিটা খোয়া, প্রতিটা বাড়ির প্রত্যেক দেওয়াল, এমনকী নতুন বাড়িগুলো উঠেছে যে পুরোনো বাড়িগুলো ভেঙে তার প্রতি বর্গ ইঞ্চি আমি চিনি। মানুষগুলো পালটে-পালটে গেছে। শুধু নতুন মানুষই আসেনি, পুরোনোরাও পালটে গেছে। না পালটানো এক পুরোনো বন্ধুর বাড়ি এসেছি তার ছেলে ও ছেলের এক বন্ধুকে পড়াতে। পড়াতে পড়াতেই ছাত্রের মোবাইলে ফোন। মেয়ে টুপাই ইউনিভার্সিটি থেকে এ পাড়াতেই পড়াতে আসছিল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রাস্তায় মাথা ঘুরে বসে পড়েছে বন্ধ ভারতী সিনেমার পাশে এক পানের দোকানে। সেখান থেকে সে তার মোবাইলে ফোন করে জানাল — একদম উঠে দাঁড়াতে পারছে না। তাকে ওখানে বসতে বলে আমি আর দুই ছাত্র নব আর অরুণাভ ছুটে বেরোলাম।

আমি ঠিক ছুটতে পারছি না। বাড়ি পালটানোর সময় মাল টানাটানি করে কোমরে ব্যথা হয়েছে। ছাত্র দুজন আবার টুপাইয়ের কাছেও পড়ে। ওরা বলল, 'আপনি আস্তে আস্তে আসুন। আমরা গিয়ে দিদিকে দেখছি।' আমি তিনস্টপ হেঁটে যখন পৌঁছালাম দেখি ওরা টুপাইকে নিয়ে ট্যাক্সি করে পুরোনো পাড়ার দিকেই রওনা দিয়েছে। আরেকজন আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

পুরোনো পাড়ার আরেক বন্ধুর বাড়িতে মেয়েকে শুইয়ে রেখে, খানিক সুস্থ করে তারপর তাকে তার টিউশনি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, আমার আরেকটা টিউশানি সেরে যখন ফিরলাম তখন টুপাই মোটেই সেরে ওঠেনি। বমি করেছে, মাথা ঘুরছে। আমার হাত ধরে ধরে বাস স্ট্যান্ডে এল। সেখানে রাত ৮-৩০টায় কোনো বাস নেই। বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন, তেলের দাম বাড়ায় বাস কম চালানো ইত্যাদি কারণে বাস খুব কম। একটা ট্যাক্সিও নেই। দুজন বাসের জন্য অপেক্ষমান যাত্রী ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য নিতে বলল। কিন্তু খালি ট্যাক্সি না থাকলে পুলিশ কী করবে? শেষে একটা গড়িয়া স্টেশন হাওড়া স্টেশনের মিনিবাসে উঠে মেয়েটা অসুস্থ বলায় কন্ডাকটর ড্রাইভারের পাশে মোটরের ঢাকনার ওপর বসিয়ে দিল তাকে। ভয়ানক গরম। কী করে মেয়ে বসে থাকবে জানি না। যে দুজন যাত্রী মেয়ে অসুস্থ শুনে আমার দিকে তাকিয়েছিল তাদের সিটের সামনে আমি গিয়ে দাঁড়াতেই তারা জানলার দিক দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। আমি মনে মনে সেই রাস্তার পানওয়ালার কথা ভাবছিলাম — টুপাইকে অসুস্থ দেখে যে চোখেমুখে দেওয়ার জন্য জল এগিয়ে দিয়েছিল, নিজের দোকানের পাশে টুল পেতে বসতে দিয়েছিল।

খানিকবাদে এদিকে ভালো সিট ফাঁকা পাওয়ায় মেয়েকে ডেকে এনে বসালাম। বাস জ্যামে নড়ছে না। মেয়ে বসেও থাকতে পারছে না। বহুকষ্টে বাসস্ট্যান্ডে নেমে একটা রিকশায় মেয়েটাকে তুলে বাড়ি নিয়ে এলাম। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল পুরোনো পাড়ার পুরোনো বাড়ির বাড়িওয়ালাদের ওপর, যারা বারবার বলা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন বাড়িটা না সারিয়ে ফেলে রেখে এমন অবস্থা করল, যার ফলে এই ভারী বর্ষায় আমাদের বাড়িটা ধসে পড়ল, আর আমাদের বাধ্য হয়ে উঠে আসতে হল। এখন মুশকিল হচ্ছে, বারবার ছুটে যেতে হচ্ছে পুরোনো পাড়ায় — ওখানেই আমাদের সব টিউশানি। ফলে শরতের মোহনরূপ যাতায়াতের ধকল ভোলাতে পারছে না। আর নতুন পাড়া হালতুর এক কলোনিতে এসে মনে পড়ে যাচ্ছে একসময় আমাদের মা-বাবাদের ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসার সময় কতটা কষ্ট পেতে হয়েছিল। চলতে চলতে এখানে এসে থেমেছি। চলার পথ থামেনি, সেটা মনের মধ্যে বাঁক খেয়ে ঢুকে যাচ্ছে যেখানে ফাঁকা ঘরে রেডিওতে শারদীয় গান বাজছে — জানি গো আজ হা হা রবে তোমার পূজা সারা হবে নিখিল অশ্রুসাগরকূলে ...।

খ ব রে দু নি য়া

'আমার স্ত্রী এবং আমি আশাবাদী, আমার ওপর যা হয়েছে, আমার ছেলের ওপর তা হবে না'

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আমেরিকার ম্যানহাটন-এর হারলেম-এ এক শিখ অধ্যাপক ও ডাক্তার আক্রান্ত হন, কিছু কিশোর তাঁকে মুসলমান ভেবে 'ওসামা, সন্ত্রাসবাদী' বলে গাল দিতে দিতে আক্রমণ করে। ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি এই প্রবন্ধটি লেখেন ডেইলি নিউজ কাগজে। •

লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে চলেছে, ঘৃণার পাত্র হয়ে মার খেয়ে কেমন লাগল? এর একটাই উত্তর আমার আছে, আমি কৃতজ্ঞ। কেন আমি কৃতজ্ঞ, তার কতগুলো কারণ আছে। তারা যদি আরও হিংস্র হত, তাহলে হয়তো আমি নিজের মুখে তার বর্ণনা দিতেই পারতাম না। যদি তারা আর এক ঘন্টা আগে আমায় আক্রমণ করত, তাহলে হয়ত আমার স্ত্রী আর এক বছরের সন্তানও আক্রান্ত হত। এবং একটা জনবহুল জায়গায় বদলে তারা কোনো জনশূন্য জায়গায় আমায় মারতে এলে আমায় বাঁচানোর মতো কাউকে আশেপাশে পেতাম না।

আমার মনে পড়ছে, যারা আমাকে মারছিল, তারা 'ওসামা', 'সন্ত্রাসবাদী' বলে গাল পাড়তে পাড়তে আমার দাড়ি খামচে ধরেছিল। কিন্তু যখন ওরা আমায় মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল, সেই সময়ের স্মৃতিটাই সবচেয়ে ভয়ানক। আমি অপেক্ষা করছিলাম, কখন ওদের লাথি আর ঘুষি থামবে।

ঠিকই, আমায় যারা মারল, তারা আমার একটা চোয়াল ভেঙেছে, কয়েক পাটি দাঁত ভেঙেছে, গাল দিয়েছে। তবু আমি মনে করি, আরও খারাপ কিছু হতে পারত। আমি ম্যানহাটন-এর ইস্ট হারলেম-এ থেকে ডাক্তারি করি। আমি জানি, ঘৃণার বশে মানুষ আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারে। তাই আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করি।

লোকে আমায় জিজ্ঞেস করছে, আমি কি পাড়া থেকে চলে যাব? আমার বউ আর আমার মোটেই ইচ্ছে নেই পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার। এই জমজমাট বন্ধুবৎসল পাড়াটায় আমরা কয়েক বছর যাবৎ মজা করে থাকছি। আমাদের মোটের ওপর ভালোই অভিজ্ঞতা। আমাদের এই পাড়াটাতে কাজ করতে ভালোবাসি। আমরা আমাদের পেশার জীবনটি সেইভাবেই সাজিয়েছি, যাতে এই পাড়াটাতে, আমাদের পড়শিদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া যায়। আমার স্ত্রী সদ্য সিটি হেলথ ওয়ার্কস বলে একটা অলাভজনক সংস্থা তৈরি করেছে, যাতে এই হারলেম পাড়াটিতে অভাবীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারে। এই পাড়ার একজন ডাক্তার হিসেবে এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর হিসেবে আমার প্রাথমিক লক্ষ্য, অভাবীদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরি করা।

আমায় যারা মেরেছে, তাদের ধরার চেয়ে তাদের শেখানোর দায় আমার বেশি। আমার ঐতিহ্য আমাকে শিখিয়েছে, ন্যায্যতা এবং দায়বদ্ধতাকে মূল্য দিতে। আরও শিখিয়েছে, ভালোবাসতে, সহমর্মী হতে, সমঝদার হতে। এটা কঠিন পরিস্থিতি। আমি আমার পড়শিদের ভালোবাসি। আমি চাই, আমার বাচ্চাটার জন্য এই রাস্তাগুলো নিরাপদ হোক। কিন্তু একই সাথে, আমি চাই না, আমার পাড়ার আরও আরও কিশোর আটক হোক। এই ঘটনা, যদিও দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু তা আমাকে সাহায্য করবে এই পাড়াতে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর লক্ষ্যে একটা কথোপকথন তৈরি করতে।

আমার স্ত্রী এবং আমি চাই, আমাদের বাচ্চা এই হারলেম পাড়াতেই বড়ো হোক। যে বাচ্চারা আমায় আক্রমণ করেছে, তাদের আমি আমার বাচ্চার থেকে আলাদা করি না। একটা অসহিষ্ণু সমাজে আমার বাচ্চাটাও কি ওদের মতো কাজ করবে? সেও কি এতটাই ঘৃণা করবে?

আমার আশা, না করতে পারে না। আমার আশা, আমার পরিবার এই পাড়ারই একটা অংশ হয়ে থাকবে, পার্কে যাবে, মাঠে যাবে, সম্পর্ক তৈরি করবে কাজের মাধ্যমে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেই এইসবই আরও ঐক্যবদ্ধ করবে। একদিন আমার ছেলে বড়ো হয়ে শিখ বিশ্বাস চর্চা করার সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। আমার আশা, আমার পাড়া এবং গোটা আমেরিকার সমস্ত পাড়া তাকে সহায়তা করবে, যদিও তাদের পথ ভিন্ন হতেই পারে।

তাই আমার উত্তর হল, আমি কৃতজ্ঞ। কালকেও আমি বলব, আমি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ ওই নার্সদের প্রতি, ওই বয়স্ক আমেরিকানদের প্রতি যারা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ হারলেম পাড়াটির প্রতি, কলম্বিয়া কৌমের প্রতি, শিখ কৌমের প্রতি। আমি কৃতজ্ঞ একজন স্বামী হিসেবে, বাবা হিসেবে, ডাক্তার, আমেরিকান, শিক্ষক, অ্যাডভোকেট, এবং পড়শি হিসেবে।

এই কৃতজ্ঞতা থেকেই আমার স্ত্রী এবং আমি আশাবাদী, আমার ওপর যা হয়েছে, আমার ছেলের ওপর তা হবে না।

বেতন বাড়াও! বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে বিক্ষোভ চলছে

কুশল বসু, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর •

২০১০ সালে শেষবারের মতো বেতন বেড়েছিল বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে। কিন্তু তারপর থেকে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে হু হু করে। পরের পর শ্রমিক ইউনিয়ন, মালিক ও বাংলাদেশ সরকারের বৈঠক হয়েছে, কিন্তু বেতন আর বাড়েনি। ফলে ঠান্ডা ঘরের মিটিংয়ে ভরসা না করে ২০ সেপ্টেম্বর সাভার এবং নারায়ণগঞ্জের হাজার হাজার পোশাক শিল্পের শ্রমিক রাস্তায় নেমে এসেছিল বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, লাঠি চালিয়েও অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারেনি। পরপর পাঁচদিন ধরে বিক্ষোভে উত্তাল হয় এই দুটি শিল্পাঞ্চল। শেষে ২৫ সেপ্টেম্বর সরকার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়, বেতন বাড়ানো হবে। তবে কতটা বাড়ানো হবে সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা মেলেনি। মেলেনি কোনো সরকারি শিলমোহর। শ্রমিকদের দাবি, প্রায় আড়াই গুণ বাড়াতে হবে বেতন। প্রাথমিক ভাবে মালিকপক্ষ ২০ শতাংশ বৃদ্ধির কথা বলে।

২৬ সেপ্টেম্বর সরকারি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক বিক্ষোভে কিছুটা ভাঁটা পড়লেও সাভার ও নারায়ণগঞ্জে কিছু শ্রমিক বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকে। প্রতিবাদী শ্রমিক ও পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে প্রায় ৫০ জন আহত হয় ওইদিন। খণ্ডযুদ্ধ, অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক বিক্ষোভ এখনও চলছে। সরকার ব্যাপক হারে নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করেছে। গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় ইউনিফর্মধারী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি ছদ্মবেশী গোয়েন্দা সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। সাইনবোর্ড, বোর্ড বাজার, ভোগড়া, কাশিমপুর, টঙ্গী, নতুনবাজার ও ছয়দানা এলাকাসহ ১৫টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ।

শ্রমিকদের সংগঠন গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাভার-আশুলিয়া জোনের সাধারণ সম্পাদক খায়রুল মামুন মিন্টু বলেন, আমরা মজুরি বোর্ডের কাছে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮,১৪৪ টাকা চেয়েছি। কারখানা মালিকরা ৩,৬০০ টাকা প্রস্তাব করেছে। নভেম্বরের মধ্যে সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করবে। তিনি বলেন, আমাদের দাবি অনুযায়ী ৮,১৪৪ টাকা দেওয়া না হলে শ্রমিক ধর্মঘট, বিক্ষোভসহ কঠোর কর্মসূচি নেওয়া হবে।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata 9. Published at B23/2 Rabindranagar, P.O. Bartala, Kolkata-18. Editor Shamik Sarkar